লেখা ছবি ছায়া চিত্রকল্পকথা

তাপস সেন

আলোর সোজাসুজি পথে কোনও বাধা পড়ে যদি তাহলে গতির সেই বাধা, তা একটা গাছের ডাল বা মানুষেরশরীর যাই হোক না কেন, সেই বাধাটির আকৃতির একটা স্পষ্ট চেনা আভাস পাওয়া যায়--- যেখানে আলোকপাতের ক্ষেত্রে একটি নতুনআলোহীন ক্ষেত্র তৈরি হয়। সেটি ওই অস্বচ্ছ বাধার একটি পরিচিত চেহারা, কিন্তু চেনা অভিজ্ঞতা--- তা সে গাছের পাতা বা মানুষের ছায়ার আক ারের অবিকল সাদৃশ্য নয়, এই সব প্রতিবনন্ধকেরবাস্ত চিত্রকল্প নয়--- যদিও তার সেই নিজস্ব বিচিত্রআকারের প্রতিরূপ, --- প্রতিবিম্ব নয় কিছুতেই।

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে শু করি কিশোর মনের কৌতূহল নিয়ে নিউ থিয়েটার্সের সবাক ছায়াছবি দেখতে। মনে পড়ে সেসব ছ ায়াছবির শুতেই দেখতাম একটি প্রতীক বৃত্তের মধ্যে হাতির শুঁড়ের ছবি। অনেক পরে এই সেদিন, বারিদবরন ঘোষের বই পড়ে জানল াম ওই ছবির শিল্পী আমার প্রিয় যতীন্দ্রকুমার সেন, প্রথমআত্মপ্রকাশ যাঁর শ্রী পরশুরাম (রাজশেখর বসু) বিরচিত এবং শ্রীনারদ - চিত্রা ঙ্কিত শ্রীশ্রী সিদ্ধেরী লিমিটেড গল্পেভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার মাঘ ১৩২৯-এ, ত্রমে যিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন স্বনামে। পরশুরামের প্রথম বই গড্ডলিকা-র প্রচ্ছদ এবং প্রথম গল্প শ্রীশ্রী সিদ্ধেরী লিমিটেড -এর প্রারম্ভিক ছবি এবং গল্পশেষে একটি ছোট্ট ছবি উল্টানো গণেশমূর্তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । একে একে বইয়েরর অন্য সব গল্পেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁ াকা ইলাস্ট্রেশনগুলি।

নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক হাতির বৃত্তের নীচের অংশে বাংলা হরফে লেখা জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্। আজীবন ঐটুকু দেখেই এন.টি-র আসল ছায়াছবি দেখার মুগ্ধতার সূচনা। পরে জেনেছি এটি লেখা হয়েছিল আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে, যার অর্থ জীবের ছায়া জ্যোতিদ্বারা প্রকাশিত।

বালক বয়সেই গড্ডলিকা-র গল্প ভূশণ্ডীর মাঠে আমাকে আকর্ষণ করে। ভূশণ্ডীর মাঠে-র ছবিগুলো --- কারিয়া পিরেত সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল, পেত্মী নেত্যকালীর খেজুর ডাল দিয়ে রোয়াক ঝাট দেওয়া, নেড়া বেলগাছের ভূষণ্ডীর মাঠে-র নায়ক শিবু ভট্টাচার্যের বসার ভঙ্গি এবং উপসংহারে ভূশণ্ডীর মাঠে-র লন্ডভন্ডের প্রকাশ একটিবিচিত্র টেকনিকে আঁকা কম্পোজিশন।

মঞ্চে - চলচ্চিত্রে সব জায়গাতেই আলো ছায়ার লীলা। যত দিন যায় সময় যায়, উপকরণ ও পদ্ধতির নব নব বিকাশ ঘটে। কিন্তু অনেক সময়েই লক্ষ্য করি আনমনাভাবে ওই প্রকৃত বস্তু একটা গাছের পাতাসহ শাখাই হোক, কি সাতবাসটে শুকনো নেড়া ডালই হোক, অথবা কোন মানুষের মুখের ছবিই হোক, কেমন যে আলাদাভাবে আরও একটা আকর্ষণীয় ছবি তৈরি করে। সামান্য সাধারণ দেয়ালে বা মেঝেতে যে ছায়াপাত ঘটে তার মধ্যে বৈচিত্র্যের কি শেষ আছে ? আবছা ঝাপসা অথবা স্পষ্ট রেখার বঙ্কিম ডালপালার বিচিত্র সূক্ষ্ম চিত্র দেখলে কেমন যেন একটুঅন্য মাত্রায় মনকে নাড়া দেয়। তাই তো, আগের সংখ্যা চিত্রকল্পকথা-য় (জানুয়ারি ২০০৪) লিখেছিলাম ছায়া কাঁপে তারি ছায়া কাঁপে।

ইলেকট্রিক বাল্বের আগে Electric Incansant Lamp আবিষ্কার হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তারও বেশ কিছু বছর আগে প্রবর্তন হয়েছিল কার্বন আর্ক ব্যাম্প। দুটি পেন্সিল - সদৃশ কার্বনের ছুঁচলো মুখD.C. (Direct Current) বিদ্যুৎবাহী পথে ওই পেন্সিল-সদৃশ কার্বনের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পথে একটুখানি ফাঁক করলেই সেই ক্ষুদ্র ফাঁকের মধ্যে দিয়েে বিদ্যুৎতরঙ্গ অন্য পেন্সিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে একটি তীব্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় (স্ফুলিঙ্গ তার পায়ে পেল ক্ষণকালের ছন্দ / উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারি অ ানন্দ।)। এই স্ফুলিঙ্গ বা স্পার্কের জন্য যথাযথ ধাতব Housing এবং পরে আলোর সামনে একটি লেন্স বসিয়ে আলো নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়েছিল ।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি আমি ওই রকম এক জোড়া কার্বন আর্ক ল্যাম্প পাই নতুন দিল্লির মিউনিসিপাল বিজলিঘরে জীবনে প্রথম চাকরির সুবাদে। সেদিন এ আলো যেন আমার নিজের কাছেই নতুন আবিষ্কার--- পুরানোকে ফিরে পাওয়া বলে মনে হয়েছিল। কেননা ততদিনে দিল্লি তথা সারাদেশেই এসে গেছে ইলেকট্রিক আলো--- মানে ফিলামেন্টযুক্ত। Incansant বাল্ব। বাড়িতে - অফিসে রাস্তার ষ্ট্রিটলাইটের স্তম্ভে সর্বত্রই ওই ইলেকট্রিক আলো। নানা সাইজের নানা ধরনের বিজলিবাতি দেখেছি সেদিন থেকেই। আর আজকের দিনের জনপ্রিয় টিউব লাইচ তো এই সেদিনের কথা, অর্থাৎ চল্লিশের দশকের কোন এক সময় থেকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি টিউবের আলো অনেক উজ্জ্বল, কিন্তু তার গড়ন ও প্রকৃতি এমনই যে তা দিয়ে কোন ছায়ার সৃষ্টি হয়না, এটা আমাদের সকলেরই দেখাও জানা।

ছায়ার মায়া আমাকে টানে, তা সে নিউ থিয়েটার্সের বা বম্বে টকিজের চণ্ডীদাস - অচ্ছুৎকন্যাই হোক, কিংবা জীবনে সংসারে চারদিকে রৌদ্রছায়া কি বিদ্যুতের হঠাৎ আলোর ঝলকানিই হোক, কিংবা সুদূর আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে আমার জন্মভূমি ধুবড়ি নামক বিদ্যুৎবিহীন জনপদই হোক--- সেদিনের সন্ধ্যারাতের সব কিছুর মধ্যে আলোর খেলা, ছায়ার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। গভীর রাত্রে নদীতে স্টিমারের তীব্র সার্চলাইট আর অন্ধকারের আবছাকেরোসিন লণ্ঠনের ম্লান মৃদু আলো, কিংবা সন্ধ্যালগ্নে তুলসীতলার কম্পমান দীপশিখা--- সব কিছুই আমাকেটানত। আশিবছরের প্রান্তে এসে আজ কি ভুলতে পারি সেদিনের বিষণ্ণ অন্ধকারে জোনাকির ঝিকিমিকি ? কি করে ভুলি নিস্তব্ধ অন্ধকারে সাত মাইল দূরবর্তী আকাশের গায়ে একটি গৌরীপুরের রাজবাড়ির (যার চলতি নামমাটিয়াবাগ প্যালেস)--- যে বাড়ি থেকে এসেছেন কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া । তাঁরই তৈরি নিউ থিয়েটার্সের মুক্তি চলচ্চিত্রে উনি একটি অসাধারণ ছায়া ছায়া পরিবেশে গ্রহণ করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে দিনের শেষে ঘুমের দেশে গানটির দৃশ্যে । পরে আরও জেনেছি, ওই দৃশ্যের সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন বিমল রায়, পরিচালক হিসাবে যিনি পরে ওই নিউ থিয়েটার্সের ছবি উদয়ের পথে করে আরও বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

সে-সময়ে আমি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম ওই বিষণ্ণ আলোছায়াতে মুক্তি চলচ্ছবি এবং তার গানের চিত্ররূপ ঘরেও নহে পারেও নহে / যেজন আছে মাঝখানে... ইত্যাদি।

ওটি আসলে ছিল একটি শিলুয়েট দৃশ্য। অনেক পরে জেনেছি এই শিলুয়েট শব্দটির উৎপত্তি কবে, কোথায় এবং কিভাবে।

১৯৫১ সালে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের ছোট উপন্যাস চার অধ্যায় অবলম্বনে চার অধ্যায় নাটকের মঞ্চ প্রয়োগ করেছিলেন। সেদিনে কিন্তু কিছু না জেনে না বুঝেই আমি ওই নাটকে একটি দৃশ্যের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করেছিলাম। সে - প্রসঙ্গে আসার আগে শিলুয়েট - প্রসঙ্গে কিছু বলে নিই।

শিলুটেক কথাটার এতদিন আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা - অনুসারে একটা মানে করে নিয়েছিলাম।একটু খোঁজ - খবর করতেই জানতে পারলাম, কথাটা এসেছে ফরাসি ইতিহাসের পাতা থেকে। শিলুয়েট আদতে ছিলেন একজন ফরাসি রাজপুষ Elienne desilhouette (১৭০৯ - ৬৭)। উনি একজন অর্থনীতিবিদও বটে। শিলুয়েট ফরাসি দেশে মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। বরং ১৭৫৭ সালে উনি ফরাসি দেশের কন্ট্রোলার জেনারেল হবার পর তাঁর নেওয়া অর্থনৈতিক পদক্ষেপ জনমানসে অতিশয় বিরূপ প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ওঁর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আর্থিক বরাদ্দ কাটছাঁট করা হল, ফলে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। কালত্রমে আউটলাইন থেকে ঘন কালো রূপ--- এমনকি কালো পটভূমিকায় শাদা আকারও শিলুয়েট নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে শিলুয়েট -এর সঙ্গে আঁকাজোকার কোন সম্পর্ক ছিলনা।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট শব্দের কথা বলি, এটি হল ভিনিয়েট। এই শব্দটিও ফরাসি। কোন ছবির কেন্দ্রীয় অংশকে এর দ্বারা স্পষ্ট চার পাঁচটা আবছায়া মিলিয়ে দেওয়া হয়। ভিনিয়েট দৃশ্যকলায় এটাও একটা অবশ্যই ভাববার এবং বলবার মতো বিষয়।

রক্তকরবী অভিনীত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ রছর আগে ১০মে ১৯৫৪ সালে। তার ঠিক তিন বছর আগে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়-এর মঞ্চ প্রয়োগ করেন ১৯৫১-য়। উপন্যাসে চার অধ্যায় প্রকৃতই চারটি অধ্যায়ে বিধৃত, রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় নানা চরিত্রের সংলাপ - কথাবার্তার মাধ্যমে। এই চারটি অধ্যায়কে শম্ভুবাবু বড় বিচিত্রভঙ্গিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পরিকল্পিতভাবে বেশ ছক কষে এগিয়ে নিয়ে চলেন। প্রথমে একটি চায়ের দোকান । দ্বিতীয় দৃশ্য এলার নিজস্ব শয়নকক্ষ। তারপরের ঘটনা শহরের বাইরে একটি পরিত্যক্ত পোড়া নির্জন বাড়ি। বাড়িটি একটি হিন্দুস্থানি রঙের কারবারির দখলে। সে সেখানে সারাদিন শাড়ি-কাপড় রঙ করে। তার সুন্দর বর্ণনাও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে। ওই নির্জন ঘরে অন্তর অজ্ঞাতবাস। শেষ বা অন্তিম দৃশ্য হল এলার বাড়ির ছাদ। গভীর রাত্রে এখানেই নাটকের চরম ও চূড়ান্ত পরিণতি -- শেষ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে এলার ঘরে অন্তু ও এলার সাক্ষাৎ। একান্ত নিরালায় দু'জনের পূর্বস্মৃতি চারণ। সে আলাপচারিতা অত্যন্ত গভীর ও আবেগপূর্ণ । বর্ণনায়, কথাবার্তায় বোঝা যায়, ত্রমে দিনের আলো কমে আসছে। শম্ভুবাবু চাইলেন সেই সংলাপের বিশেষ মুহূর্তে স্টেজের আলো যেন ঝাপসা, প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে।

এই নিবিড় সংলাপে অন্তু ও এলা তাদের অনতিঅতীত দিনের প্রথম পরিচয়ের বর্ণনায় ফিরে যায়--- স্টিমারে সেই প্রথম পরিচয় পর্ব। শম্ভুবাবু চেয়েছিলেন ওই এক -দেড় পাতা দীর্ঘ সংলাপের লাইনগুলো উচচারিত হওয়ার সময়সীমার মধ্যে দর্শকের অলক্ষ্যে ঘরের অ ালো ক্রমে ক্রমে অধি ধীর গতিতে কমিয়ে আনতে হবে এবং তারই মধ্যেস্পষ্ট আলো ফেলার সময়, পেছনের ঘরের দেয়ালটি স্বল্প আলে াকে আভাসিত করে রাখতে হবে। উনি চান মঞ্চেদুই চরিত্রের একটি ছবির আদল গড়ে উঠুক।

সেইমত আমি ১৯৫১ সালে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে প্রথম রিহার্সালে নিজের হাতে দু-জোড়া স্পট লাইট মঞ্চের সামনের ভাগকে আলোকিত করার জন্য ব্যবহার করে, ডিমারে ওই চার অধ্যায় -এর লাইনগুলো অনুসরণ করে, ক্রমে স্টেজের আলো কমিয়ে একেবারে অন্ধকার করে দিলাম। ইতিমধ্যে দর্শকের অজান্তেই পিছনের চটের দেয়ালে জ্বালিয়ে দিয়েছি চেয়ারের আড়াল থেকে তিনটে একশো পাওয়ারের ল্যাম্প। প্রায় সন্ধ্যা। সামনে অন্ধকার হয়ে গেল, আর ওই দেওয়ালে আবছা আলোয় মূর্ত হয়ে উঠল অন্তু - এলার ছায়ার মত র পরেখা। এইটা একটা নতুন প্রাপ্তি। পরে আমি জেনেছিলাম এটা ছায়া নয়, ওদের শিলুয়েট। না জেনেই করে ফেলেছিলাম। নির্দেশক দর্শক সবাই তো দাণ খুশি। কয়েক লাইন পরে অন্তুর কথা আমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের তলায় --- এই বহুবচন কথাটি উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তু হাত দেয় ঘরের ইলেকট্রিক সুইচে, সেই মুহূর্তে সামনের সব আলো জ্বলে উঠতে, সব কাব্যকল্পনা রোমান্টিক ভাব কেটে গিয়ে রূঢ় বাস্তব ফিরে আসে সমগ্র পরিবেশে।

চিত্রকল্পকথা-র গত সংখ্যায় (জানুয়ারি ২০০৪) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর পরশুরামের দোহার রচনায় পরশুরামের (রাজশেখর বসু) সঙ্গে নারদের (যতীন্দ্রকুমার সেন) তুলনা করেছিলেন তাঁদের দুজনের দীর্ঘ নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করে। এঁদের দুজনের লেখা ও ছবি প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়েছিল লুই ক্যারল ও টেনিয়েল জুটিকে। এ - সম্পর্কে আমার মনে পড়ে শিব্রাম চক্রবর্তীর লেখার সঙ্গে শৈল চক্রবর্তীর আঁকার কথা।

ভূশণ্ডীর মাঠে-র প্রায় শিলুয়েটধর্মী ছবি আমাকে ভূশণ্ডীর মাঠে ছায়া নাট্য করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অবশ্য ছায়ানাট্য সম্পর্কে আম ার ভাবনা চিন্তার সূত্রপাত প্রকৃতপ্রস্তাবে উদয়শঙ্করের ছায়ানাট্য রামলীলা দেখেই। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভূশণ্ডীর মাঠে ছায়া নাট্য করার সময় আমি রাজশেখর বসুর লিখিত অনুমোদনও পেয়েছিলাম । তারপর আমার শিল্পগু প্রতাপ সেনের সহযোগিতায় আমার সমস াময়িক বন্ধুবর্গের সহায়তায়, ভূশণ্ডীর মাঠে মঞ্চস্থ করি ওই আমদের ইস্কুল বাতসিনা বেঙ্গলির সরস্বতী পূজায় রমা প্রেসের মাঠে সেদিন আমরা ছিলাম উনিশ-কুড়ি বছরের নাট্যপাগল বন্ধুবর্গ, আর আমাদের মূল ভাবনাকার ছিলেন আমার প্রণম্য ড্রয়িং শিক্ষক প্রতাপ সেন, যিনি বয়সে আমাদের থেকে চার পাঁচ বছরের সিনিয়ার। প্রতাপদাসহ আমার অর্ধশতাব্দী আগেকার ভূশণ্ডীর মাঠে-র সহশিল্পী ও সহকর্মীরা, এই অধম বাদে, প্রায় সবাই আজ ওপারে।

চিত্রকল্পকথা থেকে সংগ্রীহিত